অন্নদামঙ্গল কাব্যে লোক উপাদান ও লোক ঐতিহ্য

অন্নদামঙ্গল কাব্যে পুরাণের প্রভাব মঙ্গলকাব্যের রীতি মেনে একেবারে যথাযথ। তবু ভারতচন্দ্র প্রচলিত সাহিত্যধারায় অন্য সুর সংযোজন করে স্বাদ বদলালেন কাব্যের—'নূতনমঙ্গল' নামে তাই তিনি তাঁর কাব্যকে চিহ্নিত করলেন। দেবতার কথা, দেবতার জীবন মানুষের ছায়ায় মানবপ্রতিম হল। স্বভাবতই পৌরাণিক ঐতিহ্যের পালনীয় আচারটুকু মেনে *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে কবি সঞ্চারিত করলেন প্রচলিত লোকজীবনের ধারা। এই কাব্যের প্রথম খণ্ডে লোক-ঐতিহ্যের কাছে কবির বার বার ফিরে যাওয়া তাঁর লোকজীবনগত ইহমুখিনতাকেই প্রমাণ করল।

'লোক' এবং 'ঐতিহ্য'—এ দুইয়ে মিলেই গড়ে ওঠে 'লোকঐতিহ্য'। এই 'লোক' বিশেষ কোন ব্যক্তি মানুষ নয়, বরং এর আড়ালেই লুকিয়ে থাকে এক বৃহৎ লোকসমাজ। এখানে ব্যক্তি গৌণ সমষ্টিই মুখ্য। অন্যদিকে ইংরেজি Tradition শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ রূপে এসেছে 'ঐতিহ্য' শব্দটি। ঐতিহ্য হল প্রজন্ম পরম্পরায় বাহিত ধারণা, বিশ্বাস, প্রথা ইত্যাদির হস্তান্তর। তা হস্তান্তরিত হয় মুখে-মুখে, আচারে-ব্যবহারে, এবং একে আয়ত্ত করতে হয় চেষ্টাপ্রসূত অনুকরণের দ্বারা। তবে ঐতিহ্য শুধুমাত্র অতীতসর্বস্ব নয়, তা একাধারে Temporal এবং Timeless.

এই লোক-ঐতিহ্যকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করা যায় :

(ক) বস্তুকেন্দ্রিক লোক-ঐতিহ্য।

(খ) বাক্‌কেন্দ্রিক লোক-ঐতিহ্য।

(গ) বিশ্বাস-অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক লোক-ঐতিহ্য।

(ঘ) অঙ্গ-ভঙ্গিকেন্দ্রিক লোক-ঐতিহ্য।

(ঙ) ক্রীড়াকেন্দ্রিক লোক-ঐতিহ্য।

(চ) লিখন বা অঙ্কনকেন্দ্রিক লোক-ঐতিহ্য।

ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের প্রথম খণ্ডকে অবলম্বন করে এই বিবিধ লোক ঐতিহ্যের প্রকাশ আমরা দেখব।

ক. বস্তুকেন্দ্রিক-লোকঐতিহ্য :

জীবন ধারণের উপযোগী বহু বিচিত্র বস্তুসম্ভার এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন—

(১) খাদ্য-পানীয় : *অন্নদামঙ্গল* রাজ-সভাকাব্য হয়েও দরিদ্র মানুষের অন্নবাসনাকে সঠিকভাবে প্রকাশিত করেছে। এর প্রথম খণ্ডে আসন্ন মন্বন্তরমুখী ক্ষুধাতুর চরিত্রগুলোর বুভুক্ষা এবং তার থেকে মুক্তির স্বপ্নের মধ্যেই ঐ বিশেষ অর্থনৈতিক সংকটকালে বাংলার বৃহত্তর জনমানসের সাধারণ খাদ্যতালিকার হদিস পাওয়া যায়।

এত বলি অন্ন দেহ কহিছেন শিব।
সবে বলে অন্ন নাই বলহ কি দিব॥

কি জানি কি দৈব আজি হৈল প্রতিকূল।
অন্ন বিনা সবে আজি হয়েছি আকুল॥

—একসময় অন্নদা শিবকে অন্নদান করেছেন। উপবাসী শিবের স্বপ্নের আহার্য তালিকায় আছে :

সঘৃত পলান্নে পূরিয়া হাতা।
পরশেন হরে হরিষে মাতা॥
.....
পায়সপয়োধি সপসপিয়া।
পিষ্টকপর্বত কচমচিয়া॥
চুকু চুকু চুকু চুষ্য চুষিয়া।
কচর মচর চর্ব্ব্য চিবিয়া॥

সাধারণ খাদ্য-পানীয়ের পাশাপাশি নেশাগ্রস্ত শিবের প্রয়োজনের তালিকায় ছিল পোস্ত, আফিম ভাঙ :

কেহ আনি দেয় ধুতুরার ফুল ফল।
কেহ দেয় ভাঙ্গ পোস্ত আফিঙ্গ গরল॥

'সিদ্ধি'—কাব্যের প্রথম খণ্ডে স্বতন্ত্র মাত্রা পেয়েছে। ভারতচন্দ্র কাব্যের দুটি অংশের নাম রেখেছেন যথাক্রমে 'সিদ্ধিঘোটন' ও 'সিদ্ধিভক্ষণ'।

(২) গৃহস্থালি দ্রব্যাদি : অনাহারী মানুষের গৃহস্থালি শুধু মাথা গোঁজার একফালি আশ্রয় ছাড়া আর কিছুই নয়। ঘর বানাতে লাগে সামান্য কাঠ, খড় এবং বিস্তর পাতা। ঘুঁটে কুড়িয়ে যাদের জীবন চলে, বাড়ির মাটির দেওয়াল সেই ঘুঁটের আলপনাতে সেজে উঠত নিজেই ·

ভাঙ্গা কুঁড়ে ছাওয়া পাতে বৃদ্ধ পিতা মাতা তাতে
ঠাঁই নাহি হয় চারি জনে।

—আর এমন বাড়িতে সম্ভার বলতে গুছিয়ে রাখা কাঠ আর ঘুঁটে :

কাঠ ঘুঁটে কুড়াইয়া রাখিয়াছি সাজাইয়া।
আর বাছা না পারি বহিতে।

(৩) পরিধান-প্রসাধন : *অন্নদামঙ্গল*-এ যখন 'বিদ্যাসুন্দর' বা 'অন্নপূর্ণামঙ্গলে'র সম্পদেব স্ফীতি বর্ণিত হয় তখন তার ভাষা হয় একরকম—প্রসাধনও তাই। কিন্তু তা যখন প্রথম খণ্ডের মত দুস্থ লোকজীবনের নির্ভেজাল দলিল হয়ে ওঠে তখন দেখা যায় অন্নদার আসন্ন কৃপা-পুষ্ট হতে চলা পদ্মিনীর বেশবাস—

হেন কালে এক রামা স্নান করি যায়।
তৈল বিনা চুলে জটা খড়ি উঠে গায়॥

—সে নিজেও বলে এয়োতির চিহ্ন বলতে তার একগাছি লোহা ছাড়া কিছু নেই। পদ্মিনী নামের চিহ্ন একবিন্দু অবশিষ্ট নেই তার। তাই তার ব্যঙ্গোক্তি—

পদ্মগন্ধ যার গায় সে হয় পদ্মিনী।
পদ্মপাত পরি আমি হয়েছি পদ্মিনী॥

অবশ্য 'অন্নদার মোহিনীরূপ' অংশে কবি সমৃদ্ধির চমৎকার ঘটিয়েছেন। 'মণিময় আভরণ', 'রতন কাঁচুলি শাড়ী', মুক্তাসজ্জিত তনু-বিকরণে অন্নদা এখানে মোহময়ী।

(৪) যানবাহন : দূরে যাত্রার জন্য এবং সেই সঙ্গে চারপাশের পরিবেশ আর মানুষকে জানতে লোকসমাজ উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন ধরনের যানবাহন প্রস্তুত

করেছে। এগুলিকে বলা যায় 'লোকযান'। এই লোকযান দু-ধরনের—স্থলযান ও জলযান। 'স্থলযানে'র মধ্যে গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি এবং পালকির বহুল ব্যবহার দেখা গেছে। প্রথম খণ্ডে হিমগিরির কন্যার সঙ্গে শিবের বিবাহ প্রসঙ্গে এসেছে বরবেশী মহাদেবের বলদবাহনের কথা।

বলদে চড়িয়া শিঙ্গা বাজাইয়া
এল বর ভূতনাথ॥

—আর অন্নদার ভবানন্দভবনে-যাত্রা প্রসঙ্গে এসেছে জলযানের কথা। গঙ্গার তীরে উপনীত অন্নদা ঈশ্বরী পাটনীর খেয়ায় নদী পারাপার করেছেন। ক্ষুদ্র সেই ডিঙ্গিতে স্থান সংকুলানের অভাব ছিলই। তাই ঈশ্বরী সাবধান করেছে অন্নদাকে।

(৫) বাদ্যযন্ত্র : দৈনন্দিন জীবনচর্যার বাইরে আমোদ-প্রমোদ তথা অবসর বিনোদনের ক্ষেত্রেও লোকসমাজ তার সৃজনীশক্তিকে কাজে লাগিয়েছে। উদ্ভাবিত হয়েছে নানান বাদ্যযন্ত্র। আলোচ্য কাব্যে এই সূত্রে পাওয়া যায় বেশ কিছু বাদ্যযন্ত্রের নাম। ডমরু, পিনাক, শিঙ্গা ইত্যাদি।

জয় শিব নাচহি পাঁচহি তালা।
বাজত ডমরু পিনাক রসালা॥

খ. বাককেন্দ্রিক লোকঐতিহ্য

লোকজীবনচর্যার যে সমস্ত উপকরণ মুখে মুখে সৃষ্টি হয়ে মুখে মুখেই জীবিত আছে সেগুলি বাক্-কেন্দ্রিক লোক-ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত। বাক্‌কেন্দ্রিক লোক-ঐতিহ্যের "জন্ম যেমন মুখে মুখে, পূর্ববর্তী সমাজ থেকে পরবর্তী সমাজে, এক দেশ বা সমাজ থেকে অন্য দেশে বা সমাজে, তার প্রচারও তেমনি মুখে মুখেই হয়ে থাকে।" ছড়া, প্রবাদ, কথা, ধাঁধা, গীতি, গীতিকা প্রভৃতি বাক্‌কেন্দ্রিক লোক-ঐতিহ্যের অন্তর্গত।

ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে বাক্‌কেন্দ্রিক লোক-ঐতিহ্য মূলত প্রবাদকে আশ্রয় করে ব্যক্ত হয়েছে। এই সব প্রবাদের স্রষ্টা স্বয়ং কবি। সমাজজীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় এগুলির জন্ম।

প্রবাদ হিসেবে স্বীকৃত চরণ বা পঙক্তির সংখ্যা অগণন। তার মধ্যে দু-একটি—

ক. ঘরে অন্ন নাহি যার, মরণ মঙ্গল তার।
খ. লোহা যেন হেম হয় পরশ-পরশে॥
গ. ভবিতব্যং ভবত্যেব খণ্ডিতে না পাবে॥
ঘ. মাটি মুটা ধর যদি সোনা মুটা হবে॥
ঙ. অযোগ্য হইয়া কেন বাড়াও উৎপাত।
খুঁয়ে তাঁতি হয়ে দেহ তসরেতে হাত॥

বাক্‌কেন্দ্রিক লোক-ঐতিহ্যের আর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ 'লোককথা'। লোককথা মানে লোককাহিনী বা মুখে মুখে প্রচলিত গল্পের ধারা। একে বলা যায় মৌখিক কথাসাহিত্য। *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের প্রথমখণ্ডে শিবের বিবাহযাত্রাকে কেন্দ্র করে ভূত-প্রেত ইত্যাদি উপকরণের সমবায়ে 'লোককথা'-র প্রয়োগ ঘটিয়েছেন কবি।

শিবের সঙ্গে উমার পরিণয়ের দিন নির্দিষ্ট হয়েছে। মহাদেব সঙ্গীসাথী নিয়ে যাত্রা করলেন হিমালয়ে উদ্দেশে। বরযাত্রীদের মধ্যে দেবতা-ভূত-প্রেত সকলেই আছেন। কিন্তু

ভূত-প্রেতের প্রমত্ত উল্লাসের ঠেলায় শেষপর্যন্ত দেবতারা সরে পড়লেন। এদের উল্লাসবর্ণনা প্রসঙ্গে কবি লিখছেন :

ঝুপ ঝুপ ঝাপ দুপ দুপ দাপ
লম্প ঝম্প দিয়া চলে।
মহা ধুমধাম হাঁকে হুম হাম
জয় মহাদেব বলে॥
সহজে সবার বিকট আকার
সহিতে না পারে আলো
থাবায় থাবায় মশাল নিবায়
আন্ধারে শোভিল ভালো॥

বেশ কৌতুককর আবহ রচিত হয়েছে এই অংশে।

গ. বিশ্বাস-অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক লোক-ঐতিহ্যের প্রয়োগ :

লোক-বিশ্বাস, সংস্কার, প্রথা, আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি প্রভৃতি লোকজীবনের বিভিন্ন দিকগুলি এ-শাখার অন্তর্গত।

(১) বিশ্বাস-সংস্কার অবশ্য ব্যক্তিগত নয় গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের দীর্ঘ ঐতিহ্যের দ্বারা লালিত। এ-বিশ্বাসে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া কার্যকরী না হওয়ায় এর সত্যাসত্য নিয়ে কোন প্রশ্ন ওঠে না।

অন্নদামঙ্গল কাব্যে (১ম খণ্ড) ভারতচন্দ্র দুঃখের-আভূষণে সজ্জিত হরগৌরীর গৃহস্থালিতে বেদনা, অশ্রু, বঞ্চনা আর অনশনের অনিবার্য-পরিণতি দাম্পত্য-কলহে—এই লোকবিশ্বাসের প্রতিফলন দেখিয়েছেন। বিষের-জ্বালার চেয়ে বড় খিদের জ্বালা—নীলকণ্ঠ মহাদেব ক্ষুধাভগ্ন কণ্ঠে স্ত্রীর সঙ্গে কলহে মেতেছেন। পারস্পরিক বাক্যবিনিময়ের মধ্যে সক্রোধে বেরিয়ে এসেছে লোক-বিশ্বাসের এক-একটি দিক :

বিধাতার লিখন কাহার সাধ্য খণ্ডি।
গৃহিণী ভাগ্যের মত পাইয়াছি চণ্ডী॥
... ...
কিবা শুভক্ষণে হৈল অলক্ষণা ঘর।
খাইতে না পানু কভু পুরিয়া উদর॥
... ...
পরম্পরা পরম্পর শুনি এই সূত্র।
স্ত্রীভাগ্যে ধন পুরুষের ভাগ্যে পুত্র॥

(২) বিশ্বাস-সংস্কার ছাড়া এখানে প্রথা-লোকাচারের বিষয়টিও এসে যায়।

সমাজ নিয়ত পরিবর্তনশীল। কিন্তু সমাজের এই বহিঃরূপান্তরের অন্তরালে সামাজিক আন্তর-সত্তার একটি মূলগত ঐক্য লক্ষ করা যায়। সমাজদেহে সঞ্চালিত মানব-আচরণের একটি প্রায় স্থায়ী আদর্শের জন্যই এই ঐক্য সৃষ্টি হয়। এরই নাম 'প্রথা'। এই প্রথার নানাবিধ শ্রেণীবিভাগের মধ্যে একটি হল লোকাচার। যে-কোনো প্রথার লোকাচার হিসেবে পরিগণিত হওয়ার প্রধান শর্ত হল কোন অনুষ্ঠানের সঙ্গে তার সংযুক্তি।

অন্নদামঙ্গল কাব্যের 'শিববিবাহ' অংশে মা মেনকা ও তাঁর সঙ্গিনী এয়োগণকে দিয়ে জামাতা বরণের সময় এ হেন লোকাচারের ছোঁয়া পাওয়া যায় :

শিব গোত্র শম্ভু শর্ব্ব শঙ্কর প্রবর।
শুনিয়া বিধিরে চাহি হাসিলেন হর॥
এরূপে গিরিশে গিরি গৌরী দান দিলা।
স্ত্রী আচার করিবারে মেনকা আইলা॥
... .
এয়োগণ সঙ্গে করি প্রদীপ ধরিয়া।
লইয়া নিছনিডালা হুলাহুলি দিয়া॥...

ঘ. **অঙ্গভঙ্গিকেন্দ্রিক এবং (ঙ) ক্রীড়াকেন্দ্রিক লোক ঐতিহ্য :**

অন্নদামঙ্গল কাব্যের প্রথমখণ্ডে শিবনৃত্য, নন্দী-ভৃঙ্গী প্রভৃতির ভূতনৃত্য কিংবা 'রাঙ্গাচিঙ্গা' বালকদের শিবকে ঘিরে নানাবিধ কৌতুক ক্রীড়ায় এই ধরনের লোক-ঐতিহ্যের ধারা অনুসৃত হয়েছে।

এইসব নানাবিধ লোক-ঐতিহ্যের উপাদানসমবায়ে ভারতচন্দ্রের কাব্যে লোকজীবন স্পষ্টতা পেয়েছে। একদিকে হর-গৌরীর কলহ-বিবাদে তৎকালীন বাংলার লোকজীবনের ছায়াপাত ঘটেছে—নিষ্কর্মা উদাসীন স্বামী, অভাবে জর্জ্জরিতা স্ত্রী আর সেই সঙ্গে বাউন্ডুলে কতগুলো ছেলে-মেয়ে—একবেলা আহার জোটে তো আরেক বেলা জোটেনা—বাঙালির সংসারের এ অতি বাস্তব ছবি—অন্যদিকে ঈশ্বরী পাটনীর মতো লোকচরিত্র। খেয়াঘাটের মাঝির দিনগুজরানের সামর্থ্য অতি ক্ষীণ। অনাহারে অর্ধাহারে কোনোক্রমে দিনাতিপাত। একদিন ছদ্মবেশিনী অন্নদার তাঁর নৌকায় পদার্পণ। ভাঙা কাঠের সেউতির সোনার কাঠামোয় রূপান্তর। তবু ব্যক্তিত্বে অবিচল ঈশ্বরী। সেধে কিছু চায়নি দেবীর কাছে। শেষপর্যন্ত অন্নদার অনুরোধে তার প্রার্থনা :

প্রণমিয়া পাটুনী কহিছে যোড় হাতে।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে॥
তথাস্তু বলিয়া দেবী দিলা বর দান।
দুধে ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান॥

যে ঈশ্বরী পাটনীর ভাঙা নৌকা দিয়ে অবিরাম জল ওঠে, নৌকাটুকু ভেঙে গেলেই যার রুজি-র পথ একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবে—সেই পাটনী দেবীকে নাগালের মধ্যে পেয়েও রাজ-ঐশ্বর্য বা পরকালের স্বর্গসুখ কামনা করে না। তার প্রার্থনা—ভবিষ্যৎ উত্তরপুরুষের সুরক্ষিত জীবন। সন্তানের জন্য দু'বেলা দুমুঠো অন্নপ্রার্থনা—দেবীর কাছে ঈশ্বরীর এই বর প্রার্থনা আসলে তৎকালীন লোকসমাজের দুঃখদারিদ্র্য-পীড়িত প্রতিটি অভাবী মানুষের প্রার্থনা—অফুরন্ত চাহিদার শক্তিটুকুও যাদের লোপ পেয়ে গেছে।

লোক ঐতিহ্যের শ্রেণীগত বিভাজনে যে-সব লোকজীবনের ছবি কাব্যে আছে সেগুলি আলোচিত হল। কিন্তু এ-ছাড়াও লোক-জীবনের আরও ছবি আছে যেগুলি কবির লোক-জীবন সম্পর্কে নিবিড় অভিজ্ঞতার নিদর্শন। হর-গৌরীর কোন্দলের যে ছবি এঁকেছেন তাতে মনে হয় একটি আস্ত দরিদ্র-পরিবারকেই কাব্যে তুলে আনা হয়েছে—পাত্র-পাত্রীদের চলাফেরা, অঙ্গ-ভঙ্গি সবই যেন চলচ্চিত্রের চলমান ছবির মতো। ক্ষুধার্ত শিব, যার 'ক্ষুধায় কাঁপয়ে অঙ্গ'—তিনি

সংসারের ওপর তিত বিরক্ত হয়ে বলেই ফেলেন 'আর সবে ভোগ করে কত মত সুখ। কপালে আগুন মোর না ঘুচিল দুঃখ।।' আর এর জন্য দায়ী করেন অবশ্যই ঘরনিকে, কারণ 'গৃহিণী ভাগ্যেব মত পাইয়াছি চণ্ডী।।' অন্য গৃহস্বামীদেব শিব ঈর্ষাও করেন, কাবণ 'আর আব গৃহীর গৃহিণী আছে যারা। কত মতে স্বামীর সেবন করে তারা।।'—তাদের দেখলে 'আহা মবি দেখিলে চক্ষুর পাপ যায়।।' বৃদ্ধ, দায়িত্বজ্ঞানহীন অকর্মণ্য স্বামীর এই অভিযোগ গৌবী মেনে নেবেন? এরকমটি হতেই পারে না। শিবকে আঘাত করলেন তাঁর রূপ, গুণ, বয়স, সম্পদ ও অভিযোগ নিয়ে :

শিবার হইল ক্রোধ শিবের বচনে।

হায় হায় কি কহিব বিধাতা পাষণ্ডী।
চণ্ডের কপালে পড়ে নাম হইল চণ্ডী।।
[শিব নিজের মুদ্রায় উত্তরটি ফেরৎ পেলেন]
গুণের নাহিক সীমা রূপ ততোধিক।
বয়সে না দেখি গাছ পাথর বল্মীক।।
সম্পদের সীমা নেই বুড়া গরু পুঁজি।
রসনা কেবল কথা সিন্দুকের পুঁজি।।

এইসব বলে টলে গৌরী পুত্র দুটিকেও বাপের প্রতিনিধি হিসেবে তাদের প্রাপ্য মিটিয়ে দিলেন। তাব পর গৌরীর গলায় একটু অভিমানের সুর :

সবে ঘরে আমি মাত্র এই অলক্ষণ।।
করেতে হইল কড়া সিদ্ধি বেটে বেটে।
তৈল বিনা চুলে জটা অঙ্গ গেল ফেটে।।
শাঁখা শাড়ি সিন্দুর চন্দন পান গুয়া।
নাহি দেখি আয়তি কেবল আচাভুয়া।।

কার বিরুদ্ধে অভিমান? আপাত দৃষ্টিতে স্বামীর বিরুদ্ধে নিশ্চয়। কিন্তু স্বামীকে উপলক্ষ করে এই অভিমান ব্যক্ত হয়েছে গোটা সমাজের বিরুদ্ধে—যে সমাজ দরিদ্রকে আবও দরিদ্র করার প্রয়াস চালিয়ে যায়—যে সমাজ সাধারণ মানুষকে অন্ন থেকে বঞ্চিত রাখে। সেই সমাজের প্রতি গৌরীর অভিমান—এখানে তিনি দেবী নন, আঠারো শতকের এক দরিদ্র পরিবারের ঘরনি। জয়া-বিজয়াকে উদ্দেশ্য করে বলার মধ্য দিয়ে এ-অভিমান ব্যক্ত হয়েছে আঠারো শতকের গোটা সমাজের প্রতি। আমাদের কবির কানে অভিমানী কণ্ঠের সেই আর্তি পৌঁছেছিল- –তিনি সেই আর্তিকে ভাষায রূপ দিয়েছেন, আর আমরা পাঠক ইতিহাসের সেই বাস্তব ছবি প্রত্যক্ষ করছি। সম্ভবত রাজসভার কবি রাত্রিকালে সবার অলক্ষ্যে ভ্রমণ করে কান পেতে শুনতেন দারিদ্র্যের যন্ত্রণা, প্রত্যক্ষ করতেন দরিদ্র-পরিবারে সদস্যদের অসহায় মুখগুলি—না হলে এমন ছবি আঁকা বোধহয় সম্ভব হত না।

একই রকম একটি লোক-দৃশ্য শিবের ভিক্ষা যাত্রা। এই দৃশ্যে শিবের পৌরাণিক মহিমা আর বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট নেই। ভিক্ষাযাত্রা-র দৃশ্যটি আজকের অভিজ্ঞতায়ও সমর্থন পায়। 'শিবের ভিক্ষায় গমনোদ্‌যোগ' অংশে আমরা প্রত্যক্ষ করছি শিবের সেই অসহায় মুখের ছবি। 'হেঁটমুখে পঞ্চানন/নন্দীরে ডাকিয়া কন/বৃষ আন যাইব ভিক্ষায।' বেশ আড়ম্বর সহকারেই শিব ভিক্ষায় বেরিয়েছেন, শিঙ্গা, ডমরু বাজিয়ে নিজের আগমনের বার্তা পৌঁছে

দিচ্ছেন—আর তাতেই গোলযোগ। পাড়ার অর্বাচীন বালকেরা শিবকে খেপাবার রসদ পেয়ে যায় :

কেহ বলে ওই এল শিব বুড়া কাপ।
কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ॥
কেহ বলে জটা হৈতে বার কর জল।
কেহ বলে জ্বাল দেখি কপালে অনল॥
কেহ বলে ভাল করে শিঙ্গাটি বাজাও।
কেহ বলে ডমরু বাজায়ে গীত গাও॥

উদ্ধৃত অংশের প্রতিটি পংক্তিতে পৌরাণিক শিব-মহিমার কথা প্রচ্ছন্নভাবে থেকে গিয়েছে—ভিক্ষা চাওয়ার সময় শিব পৌরাণিক তত্ত্বকথা শুনিয়াছেন, তা সত্ত্বেও শিবের ভিক্ষাযাত্রার দৃশ্যটি একটি সার্থক লোক-চিত্র রূপেই গণ্য হবে।

ব্যাসকে ছলনা করবার জন্য অন্নদা জরতীবেশ ধারণ করেছিলেন। একটু দেখে নেওয়া যাক সেই ছবি :

মায়া করি মহামায়া হইলেন বুড়ী।
ডানি করে ভাঙ্গা লড়ি বামকক্ষে ঝুড়ি॥
ঝাঁকড় মাকড় চুল নাহি আঁদি সাঁদি।
হাত দিলে ধূলা উড়ে যেন কেয়াকাঁদি॥
ডেঙ্গর উকুন নিকি করে ইলিবিলি।
কুট্‌কুটি কানকোটারি কিলিবিলি॥
কোটরে নয়ন দুটি মিটি মিটি করে।
চিবুকে মিলিয়ে নাসা ডাকিল অধরে॥
ঝর ঝর ঝরে জল চক্ষু মুখ নাকে।
শুনিতে না পান কানে শত শত ডাকে॥
বাতে বাঁকে সর্ব অঙ্গ পিঠে কুঁজভার।
অন্ন বিনা অন্নদার অস্থি চর্ম সার॥

উদ্ধৃতিটি একটু বড়ই হল। কিন্তু বোঝা গেল লোক-চিত্র আঁকতে ভারতচন্দ্রের সমকক্ষ কবির সন্ধান মেলা ভার। রাজসভার কবি হলেও তাঁর অভিজ্ঞতার দৃষ্টি যে জনপদের কোণায় কোণায় পৌঁছে গিয়েছিল তার নিদর্শন পাওয়া যাবে *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের নানা অংশে। আসলে *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে (প্রথম খণ্ড) পৌরাণিক ভাবনা অপেক্ষা লৌকিক ভাবনারই প্রকাশ ঘটেছে বেশি। তাই দেবী গৌরী ও দেবাদিদেব শিব পৌরাণিক নামটুকু মাত্র অবলম্বন করে ভারতচন্দ্রের কাব্যে দারিদ্র্য ক্লিষ্ট পরিবারের অসহায় স্বামী-স্ত্রীতে পরিণত হয়েছেন। লক্ষ করতে হয় তাঁদের মুখে কবি যে ভাষা বসিয়েছেন তাও কলহপরায়ণ বিপর্যস্ত নর-নারীর ভাষা হিসেবেই মান্যতা পায়। এ-সব নিয়েই গ্রামবাংলার একটা নিটোল লোক-জীবনের ছবি আমরা পেয়ে যাই *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে। এক অর্থে *অন্নদামঙ্গল* কাব্য যেন লোকজীবনের অবলম্বন—যার পাতা ওলটালেই একের পর এক লোক জীবনের ছবি প্রত্যক্ষ হতে থাকে।